কালের কণ্ঠ

তারিখ : 19 OCT 2016
পৃষ্ঠা ১৪ ... কলাম ... ৬ ...

সেই এমসি কলেজ এই এমসি কলেজ

সেলাই করা খোলা মুখ

মোফাজ্জল করিম

সব কিছু তরুণরা করবে, তারা আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ, তারা সন্ত্রাস দমন করবে, তারা দুর্নীতি ঠেকাবে, খাদিজাদের বাঁচাবে—এসব কথা বলে সব দায়-দায়িত্ব তরুণদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে আমরা বুড়ো হাবড়ারা নাসিকায় তৈল প্রয়োগ করে পরম সুখে নিদ্রা যাব, এসব লম্বা লম্বা কথায় আমি বিশ্বাস করি না। তরুণরা অবশ্যই তাদের যখন যা কর্তব্য তা করবে। তাদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব নিজেদের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। তার জন্য জ্ঞানার্জনের কোনো বিকল্প নেই

'সারা ক্যাম্পাস জুড়ে পাতা সবুজ ঘাসের গালিচা। তার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে কালো পিচের ঝকঝকে তকতকে রাস্তা। যেন সবুজ শাড়ির কুচকুচে কালো পাড়। এখানে-ওখানে নানা রঙের, নানা জাতের ফুলের কেয়ারি। বলতে পারেন, সেই সবুজ শাড়িটির জমিনে নানা রঙের নানা ঢঙের বুটিদার কাজ। কোথাও কোথাও অবিকল একই রকম দেখতে বিরাট আকৃতির পামগাছের সারি। মূল ক্যাম্পাসের পেছন দিকে বিশাল লাইব্রেরি ভবন।... লাইব্রেরি ভবন পার হয়ে এগিয়ে গেলে কলেজ মিলনায়তন-কাম ছাত্রদের কমনরুম। তার সামনেই একটি নাতিবৃহৎ জলাশয়। ওতে কাউকে কোনো দিন স্নানটান করতে দেখা যায়নি। তবে দুপুরের রোদ টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে ওটার বুকে অসংখ্য রুপালি মুদ্রা ছড়াতে দেখেছি আমি। আর রাতের নির্জনতায় সোনালি জোছনা গায়ে মেখে পরিরা তো এমন জলাশয়েই নাইতে নামে। রোজ কলেজ ছুটির পর চারদিকের সুশান্ত সুনীল নির্জনতায় কলেজের এদিকটা মনে হয় রূপকথার মায়াপুরীর মতো। না, তখন মাদকসেবীদের নামও শোনা যায়নি, ছিনতাইকারীরাও মাটি ফুঁড়ে উদয় হতো না আঘাটা-বেঘাটায় সায়াহ্নের স্তব্ধ সমাহিত রূপটাকে ছিনিয়ে নিতে। তখন অদূরবর্তী ছাত্রাবাসের দুই বন্ধু পুকুরপাড়ে বসে যখন আনমনে ঘাসের ডগা ছিঁড়তে ছিঁড়তে নিজেদের সুখ-দুঃখের কথা বলত কিংবা অকস্মাৎ শান্ত সরসীর নীরে দুটি নুড়ি ছুড়ে মারত, তখন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নিশ্চয়ই কারো কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হতো না।' (মোফাজ্জল করিম : আপন ভুবন, অচেনা আকাশ।)

গত ৩ অক্টোবর, সোমবার থেকে টেলিভিশনের পর্দায় লাগাতার কয়েক দিন সিলেট এমসি কলেজের যে দৃশ্য আমরা দেখেছি, ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠটির এই কদর্য রূপ আমি বা আমার বয়সী কেউ আগে কখনো দেখিনি। হ্যাঁ, বছর কয়েক আগে কিছু দুর্বৃত্ত কর্তৃক এই কলেজের মনোরম ছাত্রাবাসটির কিয়দংশ পুড়িয়ে ছাই করে ফেলার ঘটনাটিও ছিল এমনি আরেকটি জঘন্য ঘটনা, যার চিহ্নিত অপরাধীরা আজও গ্রেপ্তার হয়নি। কলেজ ক্যাম্পাসে যে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে, তা আমাদের মতো এ যুগের 'অচল-আধুলিদের' কল্পনারও অতীত। ১৯...

কত সহজভাবে মেলামেশা করে। পরস্পরকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে 'আপনি-তুমি'র বেড়া ভেঙে অনেকেই একেবারে ডবল-ট্রিপল প্রমোশন নিয়ে তুই-এ নেমে গেছে। ব্যস্ত রাজপথে হাত ধরে চলাচল করছে, খুনসুটি করছে। আর ষাটের দশকে এমসি কলেজের কোনো ছাত্র বা ছাত্রী এসব কল্পনাও করতে পারত না। যখন ক্লাস শুরু হওয়ার ঘণ্টা পড়ত তখন মেয়েরা তাদের কমন রুম থেকে বের হয়ে শিক্ষকের পেছনে পেছনে মাথা নিচু করে ক্লাসে যেত। কথাবার্তা বলত মৃদুস্বরে নিজেদের মধ্যে। আর শ্রেণিকক্ষে তাদের বসার জন্য পৃথক বেঞ্চ নির্ধারিত থাকত। কলেজে তাদের সারা দিন কাটত কমন রুম নামক একটা অপরিসর কামরায় এবং ক্লাসে। ব্যস, এ পর্যন্তই। ক্যাম্পাসে হাঁটা-চলার কোনো অধিকার ছিল না তাদের। এখনকার শিক্ষার্থীরা হয়তো বিশ্বাসই করবে না কী রকম একটা 'রেজিমেন্টেড' জীবন ছিল তখনকার মেয়েদের। সুস্থ মন-মানসিকতা বিকাশের জন্য নিশ্চয়ই এটা একটা ভালো ব্যবস্থা ছিল না।

তবে হ্যাঁ, এত নেতিবাচক পরিবেশের মধ্যে অবশ্যই একটা জিনিসের নিশ্চয়তা ছিল। তা হচ্ছে, নিরাপত্তা। মেয়ে স্কুলে গেছে বা কলেজে গেছে, আর মা বাসায় বসে গেছেন জায়নামাযে তসবিহ্ জপতে : আল্লাহ, মেয়েটা যেন ভালোয় ভালোয় ফিরে আসে, এই অবস্থা সে আমলে ছিল না। রাস্তাঘাটে বখাটেদের উৎপাত, 'ইভ টিজিং', এগুলো বড় একটা শোনা যেত না। আর এখন তো ভয়াবহ অবস্থা। সমাজে যত দিন পর্যন্ত প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার না ঘটেছে, 'শিষ্টের দমন ও দুষ্টের পালন' এই নীতির অবসান না হচ্ছে, সব ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি ও প্রতিরোধ গড়ে না উঠছে, তত দিন পর্যন্ত এসব সামাজিক ব্যাধির মূলোৎপাটন সম্ভব নয়। অন্য কথায়, তত দিন পর্যন্ত আমরা সত্যিকার অর্থে সভ্য হয়ে উঠব না। নারী নির্যাতন, শিশু নির্যাতনসহ অন্যান্য জঘন্য অপরাধ দিন দিন বেড়ে চলার অন্যতম প্রধান কারণ হলো এসব অপরাধের দ্রুত বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় না। আর বিচার না হওয়ার কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক প্রয়োজনে পেশিশক্তির লালন ও আইনের শাসনের অভাব। একজন ...

যাচ্ছে—হয়তো মেয়েদের কমন রুমে যাবে বান্ধবীদের সঙ্গে দেখা করে একসঙ্গে বাড়ি ফিরতে—তখনই পাষণ্ডটি চাপাতি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। তারপর ক্রমাগত মাথায়, শরীরে ও হাতে-পায়ে সেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপাতে লাগল। মেয়েটির 'ও মাইগো, ও মাইগো' (ও মাগো, ও মাগো) আর্তচিৎকারে কে এগিয়ে এলো? না, এক মোবাইল ফোনের চিত্রগ্রাহক। 'এগিয়ে এলো' কথাটা ঠিক হলো না। সে নিরাপদ দূরত্বে থেকে পুরো ঘটনাটি মোবাইল ফোনের ক্যামেরায় বন্দি করল। আর ওই সময় আশপাশে যারা ছিল তারাও প্রায় সবাই পরীক্ষার্থী। ঘটনার আকস্মিকতায় তারা প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দৌড়ে যায় আক্রমণকারীকে পাকড়াও করতে। কিন্তু ওই দুর্ধর্ষ খুনিটা নাকি চাপাতি হাতে তাদের দিকে ধেয়ে আসে। তারা তখন বাধ্য হয় পিছু হটতে।

এখানেই আমার 'দুইখান কথা' আছে। একটা তুমুল শোরগোল তুলে 'এই খবরদার' 'ধর্ ধর্' ইত্যাদি ধ্বনিসহ একদল যুবক পাল্টা ধাওয়া দিলে ওই চাপাতি-বীর কি লাঙ্গুল উঁচিয়ে পালাত না? সে তো অপরাধী। আর অপরাধীদের হিংস্রতা, উন্মত্ততা যত প্রবলই হোক না কেন তাদের সৎ সাহস বা নৈতিক বল ('মরাল কারেজ') তো থাকে শূন্যের কোঠায়। 'যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)। আর তা ছাড়া সে তো ছিল একাকী। তার হাতে বন্দুক-পিস্তল বা অন্য কোনো আগ্নেয়াস্ত্রও ছিল না। একজন অপরাধীকে এক শ জন সাহসী তরুণ একটা শক্ত চ্যালেঞ্জ তো ছুড়ে দিতে পারত। তাতে মেয়েটির মাথায়, শরীরে, হাতে-পায়ে হয়তো এতগুলো চাপাতির কোপ পড়ত না।

জানতে পারলাম, উপস্থিত তরুণরা একটু পরেই সাহস সঞ্চয় করে আবার ছুটে যায় ঘটনাস্থলে এবং কাপুরুষটাকে পাকড়াও করে। অতঃপর অকুস্থলেই তার প্রাপ্য উত্তম-মধ্যম তাকে বুঝিয়ে দেয় আচ্ছাসে। কিন্তু ততক্ষণে অসহায় মেয়েটির ক্ষতি যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। তাই বলছিলাম, ছেলেদের এই 'রি-অ্যাকশন টাইমটা' আরেকটু কমিয়ে আনতে পারলে এবং নিজেদের ভেতর 'যা হবার হবে, ধর্ শা-কে' জাতীয় 'জোশ' আরো উদ্দীপ্ত করতে পারলে ঘটনা ...